দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

'বীরাঙ্গনা' মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য। কাব্যটি রচিত হয়েছে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু প্রথম প্রকাশ পেয়েছে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। কবির জীবদ্দশায় কাব্যটির তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পরে আর কোনো পূর্ণাঙ্গ কাব্য কবি রচনা করেন নি, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' লিখেছেন। 'বীরাঙ্গনা' পত্র-কাব্য। এই কাব্যে মোট ১১টি পত্র রয়েছে।

'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রটি 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের ১১টি পত্রের মধ্যে তৃতীয় পত্র। কবি এক-একটি পত্রকে এক-একটি 'সর্গ' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সেই হিসাবে এটি 'তৃতীয় সর্গ' নামে আখ্যাত। এই পত্র-কাব্যটির পশ্চাতে যে-পৌরাণিক কাহিনী-রেখা কাজ করেছে তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা কবি পত্রের প্রথমেই দিয়ে রেখেছেন। সেই সংক্ষিপ্ত সূত্রটি হল – "বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁর ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সঙ্গে তাঁর পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হলে, রুক্মিণী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-হরণ বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য।"

কবি মধুসূদনের উক্ত সংক্ষিপ্ত রূপরেখার উৎস হল শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ। দশম স্কন্ধের ৫২, ৫৩ ও ৫৪তম অধ্যায়ে যথাক্রমে 'শ্রীকৃষ্ণ সমীপে রুক্মিণীর সংবাদ', 'রুক্মিণী হরণ' ও 'রুক্মিণীর বিবাহ' প্রসঙ্গ আছে। ৫২তম অধ্যায়ে রুক্মিণীর দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পত্র-লেখার বিষয়টি উল্লিখিত রুক্মিণীর হৃদয়ের আর্তিটি [illegible] রুক্মিণীর মনোভাব বোঝা গেলেও তথাপি হয়েছে। পত্রটির সমগ্র অংশ থেকে [illegible], সত্য ও ফুটানো হয়েছে। কবি মধুসূদন ভাগবত কাহিনীর সমস্ত উপাদান যেন গ্রহণ করেননি, উনিশ শতকীয় নবজাগরণের আলোকে পুরাণের এই ইতিবৃত্তকে অবলম্বন করে উদ্ভাসিত করেছেন কাব্যের আধারে। তখনো নারী-জাতির নূতন নূতন দিককে [illegible] পতি নির্বাচনের স্বীকৃতি তো দূরের কথা, উল্টে সমাজ-রাষ্ট্রে কুমারী নারীর [illegible] সামাজিক প্রথা যে থেকে দশ বছরের কন্যার [illegible] বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়। এই সময়কালে কোনো সভ্য ও সুশিক্ষিত মানুষকে [illegible] নারীচেতনার প্রকাশ কীভাবে হওয়া উচিত পুরাণের কিছু সূত্রকে হাতিয়ার করে দেখালেন। যা হওয়া উচিত, যা সভ্য জাতির তা মধুসূদন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পাঠকসমাজকে জানালেন।

ভাগবতের [illegible] কিছু কিছু শিশুপালের [illegible] রুক্মিণী হরণ-প্রসঙ্গ মাত্র বিবৃতিক, তাই লেখার আকারে [illegible] আলাদা বিন্যাস করে রয়েছে। শাস্ত্রকারদের পর [illegible]

যুধিষ্ঠির রাজ্যভার গ্রহণ করে রাজসূয় যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে পিতামহ ভীষ্মের কথামতো যদুবংশে জাত বিষ্ণু-অবতার কৃষ্ণকে প্রথমে পূজা করলে চেদীরাজ শিশুপাল ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণ-নিন্দায় মুখর হন —

'লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী ভীষ্মক নৃপ সুতা॥
বিবাহ করিতে তারে করিলেক মন।
শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন॥
হরিয়া লইলি তারে রাজসভা হৈতে।
পুনঃ সেই কথা কহ নির্লজ্জ মুখেতে॥
কহ কৃষ্ণ দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে।
বরপূর্ব কন্যা হরিয়াছে কোন জনে॥'

এ অবস্থায় কৃষ্ণ জানিয়েছিলেন —

'ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিল বরণ।
কতদিন হয় নাই জানে সর্বজন॥'

রুক্মিণীই যে কৃষ্ণকে বরণ করতে চেয়েছিলেন, রুক্মিণীর প্রেমিক পুরুষটি যে কৃষ্ণ, শিশুপাল নন, একথা সবাই জানে। সুতরাং 'বরপূর্ব কন্যা'কে কৃষ্ণ-কর্তৃক হরণের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালকে বধ করতে বাধ্য হন। মহাভারতে রুক্মিণীর পত্র-লিখন প্রসঙ্গ নেই। সুতরাং মধুসূদন কবি ভাগবতের শিল্প-কৌশলকে গ্রহণ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণকে পত্রলেখা প্রসঙ্গটি সামনে রেখেছেন এবং রুক্মিণীর মনঃদ্বার খুলে খুলে করে উন্মোচিত করেছেন।

রুক্মিণীর এই পত্রে প্রথমেই শোনা যায়, মানবীয় ও নারী হৃদয়ে হতাশিত এক পুরুষের কাছে এক নারীর বিপদকালে উদ্ধারের এক করুণ আর্তি। কিন্তু ঋষিমুখে শোনা দ্বারকেশ যাদবেন্দ্র পার্থজনকে বরণ করতে অন্তরীক্ষতলে আকুলিত। তাঁর দক্ষিণ করে পাণিনীর ভার 'চিরদাসী' রূপে আশ্রয় চেয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে — পদতলে রাজনন্দিনী রুক্মিণী এ মিনতি-কালে।' এই আবেদনের কথা লিখতে — 'ভাব, হে ভাবক, ভাবে এ ... লজ্জা- সংকোচ-ভীতি প্রকাশিত হয়েছে — 'না পারে আকুল-হৃদা লিখিতে লেখনী;/ কাঁপে হিয়া থরথরে।' কিন্তু 'দেখিয়াছ রাম, তোমা বিনা / নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে।' মোক্ষরই যাচ্ঞা, এই পত্র নিবেদনের বাণী কৃষ্ণ কোমলে নির্জিত।

ভীষ্মকপুত্রী রুক্মিণী তাঁর 'হৃদয়-রতন' অর্থাৎ বাঞ্ছিত পুরুষোত্তমকে চোখে দেখেন নি, ঋষিমুখে শুধু তাঁর পরম গুণগুচ্ছের কথা শুনেছেন, আর বিপদকালে তাঁকে 'নিশার স্বপনে' দেখে তাঁরই প্রতি কায়মন সমর্পণ করে দেবতাকে সাক্ষী রেখে তাঁকেই নিজ পতিরূপে বরণ করে নিয়েছেন — 'দেবে সাক্ষী করি বরি দেব নরোত্তমে বরভাবে।'

যুগ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নারী পুরুষের — পতির দাসীস্বরূপা। সুতরাং নিজ-মুখে সেই মনপ্রাণ সমর্পিত পুরুষটির নাম উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, তবে তিনিই যে তাঁর স্বামী একথা বারে বারে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের কাছে মনো-চারণে প্রকাশ করতে পারেন, মনোজগতে জপের একমাত্র প্রার্থী তিনিই। যে পুরুষোত্তমের নাম উচ্চারণ করা পত্নীর পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁর পরিচয় লজ্জাশীলা দেবেন কীভাবে? জপের প্রাপক কে? — তাঁকে চিনিয়ে দিতে চান, চিনিয়ে নারী সহজ পথে যেতে পারছেন না, ছলপথে চিনিয়ে দিতে পরিত্রাণের উপায় থাকবে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর, নতুবা উপস্থিত বিপদ থেকে না। তাই বলছেন — 'কহিব সংক্ষেপে;

তুলিয়া কুসুম রাশি, মালিনী যেমতি
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আমি
গাঁথির গাথায়, নাথ, দেহ পদছায়া।'

অর্থাৎ মালিনী যেভাবে ফুলকানন থেকে ফুল তুলে এনে একটি একটি ফুল গ্রথিত করে সমস্ত ফুলের একত্রিত-রূপ মালা তৈরি করে প্রকৃত অর্থে সৌন্দর্যের ও সৌরভের পূর্ণবদ্ধতাকে প্রকাশ করেন, তেমনি রুক্মিণীও শিশুকাল থেকে ঋষিমুখে শোনা কথাসমূহকে একত্রে গেঁথে সেই পুরুষোত্তম-পরিণেতার অসংখ্য গুণের একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে সেই একত্রিত গুণাবলীর মধ্য দিয়ে নিজ পরিণেতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলছেন। রুক্মিণী আবার সেই পরিচয়-পর্ব শুরু করেছেন, কবি মধুসূদনের লেখনীতে তা এক নূতন মাত্রা পেয়েছে।

রুক্মিণীর বাঞ্ছিত হৃদয়-রতনের কারাগারে জন্ম — 'জন্মিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।' — কারণ রাজরোষে পড়ে তাঁর পিতা-মাতা কারাগারে রুদ্ধ ছিলেন দীর্ঘদিন। সে সময়ে সেই দুর্ভেদ্য কারাগারে দীনবন্ধু স্বরূপ পুরুষোত্তমের জন্ম। কিন্তু অন্ধকার খনিগর্ভে হীরকের উৎপত্তি, সুগভীর জলতলে শুক্তির মধ্যে মুক্তার জন্ম — 'খনিগর্ভে ফলে মণি; মুক্তা শুক্তি ধামে।' — এই সত্যকে স্মরণে রেখেই কারাগারে জন্ম সত্ত্বেও ভুবনমণ্ডল ভূষিত

উজ্জ্বল হয়ে বিভা ছড়িয়ে পড়ছিল তা যেন 'শত শরদের শশীর হাসির স্নিগ্ধরূপ এবং বাতাসে ভেসে বেড়াতে থাকে সৌগন্ধ্য। তাছাড়া এই শুভ সংবাদ নদ-নদী কলকলধ্বনিতে বাহিত হয়ে সিন্ধুসঙ্গমে ছড়িয়ে পড়ল এবং সিন্ধুর গম্ভীর নিনাদে উত্তোলিত হয়ে উঠল। এইসাথে স্বর্গে অপ্সরাগণ যেমন নৃত্যের তালে দুলে উঠল, তেমনি মর্ত্যের নরনারীও আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। আর সঙ্গীত-তরঙ্গ চারিদিকে বয়ে গেল, কুসুমরাজি হর্ষিত সত্যে যেন পড়ে শুভ সংবাদকে বরণ করল, দরিদ্র যেন ক্ষুধার অন্ন পেল, মৃতপ্রায় প্রাণী জীবনের ছন্দ খুঁজে পেল, অখিল বিশ্বে জয়জয়কার ধ্বনিত হল — 'পূরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে।' প্রকৃতিজগৎ ও প্রাণীজগৎ তাঁর জন্মে যেভাবে আনন্দিত উচ্ছ্বসিত-উদ্বেলিত-স্পন্দিত-ছন্দিত হয়ে উঠেছিল সেই বার্তা জানিয়ে রুক্মিণী তাঁর প্রিয়তম পুরুষটির ব্যতিক্রমী সত্তাকে চিনিয়ে দিলেন।

কিন্তু জন্মের অব্যবহিত পরেই সেই ব্যতিক্রমী শিশু-সন্তানটিকে বাঁচিয়ে রাখার দুশ্চিন্তা জন্মদাতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ঘোর অন্ধকার রাত্রিতেই তিনি কারাগার থেকে শিশু-পুত্রকে নিয়ে গোপনে বেরিয়ে ব্রজের গোপ-রাজ গৃহে অতি যত্নে আদরের পুত্রটিকে রেখে আসেন। আর দরিদ্রজন যেমন ধন পেলে আনন্দাপ্লুত ভাসে, তেমনি গোপ দম্পতিও শিশুসন্তান পেয়ে আনন্দ-সলিলে ভাসতে থাকেন। — 'ভাসিলা গোকুলে গোপদম্পতি আনন্দ-সলিলে।'

রুক্মিণী এরপর তাঁর বাঞ্ছিত হৃদয়েশ্বরের গোকুলে বেড়ে ওঠার কাহিনী শুনিয়েছেন। গোপ-রমা রানী সেই শিশুসন্তানকে পুত্রভাবে যত্নে পালন করেছেন। আর সেই শিশু বাল্যকালেই 'রাখালরাজ' রূপে নানান ক্রিয়াকাণ্ড করেছেন যা লৌকিক জগতে অসাধ্য সাধন —

'কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পুতনারে? কাল নাগ কালীয়, কি দোষে
লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে?
কে কবে? বক যবে রুষি, বকছিলা
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি,
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে?'

এরূপ বাল্যের আরও কত কীর্তি স্থাপিত হয়েছে। আর যৌবনে 'রসরাজ' রূপে তমালের তলে বাঁশি বাজিয়ে মোহিত করে গোপবধূদের ঘরের বাইরে যমুনা তীরে এনে লীলা সংঘটিত করেছেন। তাছাড়া 'বিহারিলা

গোষ্ঠে প্রভু যমুনা-পুলিনে!' এবং দীর্ঘদিন বিচরণ করে শেষে 'পিতৃ-অরিকে সংহার করে পুরুষোত্তম অরিন্দম দূর সিন্ধুতীরে পুরী স্থাপন করে বিপদ-মুক্ত জীবন পরিক্রমায় থাকলেন। এত সব ঘটনা-বিবৃতির মধ্য দিয়ে রুক্মিণী তাঁর বাঞ্ছিত পুরুষটিকে চেনাতে চেয়েছেন — 'দেখ চিন্তি চিন্তামণি, চেন যদি তারে।' নিজে নামটি লিখতে চাননি, চিনে নিতে বলেছেন।

পূর্বে বর্ণিত এত কীর্তি ও ঘটনাগুলোতেও যদি কে সেই পুরুষ রতন?' তাঁকে চিনে নিতে অসুবিধা হয়, তাই রুক্মিণী এবার তাঁর রূপ এঁকে দিতে চান। যে মূর্তি তিনি হৃদয়ে সংগোপনে চিত্রিত করে রেখেছেন, সেই মূর্তির ভাষাচিত্র এঁকে বাঞ্ছিত পুরুষোত্তমকে চেনাতে চান —

'না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী।'

রুক্মিণীর হৃদয়-মন্দিরে যে মূর্তি পূজিত হচ্ছে, তা হলো —

'নবীন নীরদ-বর্ণ; শিখি-পুচ্ছ শিরে;
ত্রিভঙ্গ; মৃণাল-দেশে বনগুঞ্জমালা;
মধুর অধরে বাঁশি; বাস পীত ধড়া
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে —
যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম! মোক্ষ-ধাম ভবে!'

এই মূর্তির পাশাপাশি আকাশমণ্ডলে নবজলধর দেখে শিখিপুচ্ছচূড়াধারী ও বক্ষোপরি তড়িৎ সুবর্ণধারীকে মনে করে ভক্তিভাবে পূজা ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়েছেন। মনে করেছেন — 'প্রাণকান্ত মম/আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে।' আবার নবজলধরকে চাতকিনী যদি ডাকে তবে নিজ বাঞ্ছিত পুরুষকে অন্যে আকাঙ্ক্ষা করছে ভেবে 'রাগ' করেন, ঘন জলধরকে দেখে ময়ূরী নৃত্য করলে তাকে প্রহার করেন, ঘন মেঘের মন্দ্র গর্জনে মনে হয় —

'গোপ-কুল-বালা আমি; বেণুর সুরবে
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে!'

আবার 'শিখীবর'কে বলেন,

'ধন্য তুই পক্ষিকুলে,
শিখণ্ডি! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জটি! —'

হৃদয়-মন্দিরে স্থান পাওয়া পুরুষোত্তমের রূপের এত ভিন্নতা থাকলেও যেন সংশয় যায় না। তাই আবারও বলে ওঠেন — 'আর পরিচয় কত দেব পদযুগে?
হৃদয়পটে তাঁকে রাখা নানা মূর্তি ও স্মরণে থাকা নানা অসাথী
সাথিদের ঘটনাযুক্ত স্থানের কথা ব্যক্ত করেও সংশয়ান্বিত রুক্মিণী এবার নিজ দুঃখের বার্তা জানাতে তৎপর হয়েছেন। প্রথমেই হৃদয়-মন্দিরে স্থাপিত শ্যাম-

মূর্তিকে গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসিনীর ইষ্টদেবতাকে পূজার মতো করেই রুক্মিণী পূজা করেন বলে জানিয়েছেন; অথচ তাঁকেই বরণ করার জন্য চেদীশ্বরও শিশুপাল বরবেশে হাজির হচ্ছেন বলে জনরবে শোনা যাচ্ছে। রুক্মিণীর কাছে এ তো অতি বড় লজ্জার কথা। কারণ যজনকে স্বেচ্ছায় কায়মন সমর্পণ করে বসে থাকা রুক্মিণীকে অন্য জনে বরণ করবে, এ অধর্ম কর্ম কি উচিত? কোন্ পাপে অভাগিনী রুক্মিণীর এ যন্ত্রণা ললাটে লেখা হল?—

'কেমনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী?
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, যে জনে
কায় মনঃ; অন্য জনে—ছল, গুণনিধি।—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে।
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে?'

তাই ভীত রুক্মিণী তাঁর বাঞ্ছিত পুরুষটিকে আহ্বান জানান এভাবে—
'আইস, গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি, গদাধর!'

কিন্তু পরক্ষণেই রুক্মিণীর মনে হয়—'নাহি রূপ গুণ; কোন্ মুখ দিয়া অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা?' নতুবা পুরুষোত্তমকে বলতেন—বাহন বৈনতেয় যেমন চন্দ্রলোক থেকে অমৃতরস হরণ করেছিলেন, তেমনি করে যেন এই অভাগীকে এই বিদর্ভরাজ্যে প্রবেশ করে হরণ করে নিয়ে যান। তাই কাতর প্রার্থনা—

'দীন আমি; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি;
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,
যাঁর দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে।'

আরো গভীর বেদনার কথা শোনান রুক্মিণী তাঁর প্রিয়তমের কাছে—দুরন্ত সহোদর রুক্মের প্রিয়পাত্র চেদীশ্বর, আর এই বিপরীত আয়োজন রুক্মেরই। লজ্জায় নিজ বাঞ্ছার কথা মায়ের কাছে বলতে অপারগ। তাই একমাত্র সখী চন্দ্রকলার গলা জড়িয়ে নিজ ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা ভেবে ক্রন্দন করছেন, তাও ভীতিপ্রদভাবে বিরলে বসে, প্রকাশ্য স্থানে কথা অসম্ভব। জীবনের এই সঙ্কটে দাঁড়িয়ে রুক্মিণী জানিয়েছেন—

'লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে;
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, নাশ বিঘ্ন মোরে!'

রুক্মিণী যাঁকে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তাঁর অদর্শনে ধৈর্য ধরা কঠিন, তবু কেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙেনি তার কারণটি তিনি জানাতে চান প্রাণপতিকে। রাজ-বন মাঝে যে প্রবাহিনী বয়ে চলেছে তাকেই 'যমুনা' বলে সম্বোধন করে তারই কূলে 'কত যে রোপেছি/তমাল, কদম্ব—তুমি হাসিবে হাসিলে!' শুধু তাই নয়, কুঞ্জবনে সারি-শুক, ময়ূর-ময়ূরী পোষা হয়েছে, অলিকুল গুঞ্জন করে, শাখে কোকিল কুহু ধ্বনি তোলে, কাননে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে—

কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে।
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া,
কিম্বা মোরে লয়ে, দেহ, দেহ তাঁর পদে।

শুধু পিতৃরাজ্যের বনমধ্যে যমুনাসদৃশ প্রবাহিনী নয়, গোষ্ঠে আছে তাঁর বহু গাভী; নিজ হাতে সেই সব গাভীর সেবা করেন তিনি। পত্রপ্রাপক যদুমণিকে আকুল প্রার্থনা জানান — 'কহ হে রাখালে আসিতে সে গোষ্ঠ-গৃহে'; তাহলেই উভয়ের সাক্ষাৎ সম্ভব হবে। পাগলিনী-প্রায় রুক্মিণী বাঞ্ছিত পুরুষোত্তমের যা কিছু প্রিয় সেই সব কিছুকে ভালবাসেন, যত্ন করেন; একান্ত-সত্তায় অন্য কোনো পুরুষকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আশঙ্কার কালো মেঘ জমেছে। নিজের মন-প্রকৃতি অন্যকে বলা যাচ্ছে না। এই সঙ্কট বিপদকালে — 'আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্ধর তুমি, মুরারি!'

রুক্মিণীকে শিশুপালের হাত থেকে উদ্ধার করা একমাত্র তাঁরই পক্ষে সম্ভব; কারণ — 'নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী, কংসজিত।'

শুধু তাই নয়, মধু নামের বলশালী দৈত্যকে তিনি হেলায় বধ করে হয়েছেন 'মধুসূদন।' এরূপ বহু কীর্তি স্থাপিত তাঁর এই জগত-সংসারে। সুতরাং —

'কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা যে মন; যিনি নিশার স্বপনে!'

সমগ্র পত্রিকায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোথাও সরাসরি বাঞ্ছিত পুরুষোত্তমের নামোল্লেখ করা হয়নি, বা সরাসরি পত্র-প্রাপককেই পত্র-প্রেরক রুক্মিণী হরণ করতে বলেন নি। কারণ রুক্মিণী নিজে পতি নির্বাচন করে নিয়েছেন — অন্য পক্ষের সম্মতি-অসম্মতি বিচার না করেই। সুতরাং যিনি আদৌ বিষয়টি অবগত নন, তাঁকে সরাসরি নিজ মন নিবেদনের কথা বলেন কি করে? অথচ যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে দ্রুত নিজ বাঞ্ছার কথা, হৃদয়-মন্দিরে স্থাপিত সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত পুরুষটির কাছে পৌঁছে দিতে হবে, নতুবা জীবন-প্রবাহ অন্য খাতে বইবে, যা রুক্মিণীর একেবারেই অভিপ্রেত নয়। তাই একদিকে এতদিনের সুপ্ত ইচ্ছাকে বাঞ্ছিত পুরুষ-রতনের কাছে উন্মীলন করা, অন্যদিকে ঘোর সংকটকালে তাঁর উদ্ধার জরুরি — এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া — এই উভয় সংবাদ একই সঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার কারণেই রুক্মিণীকে এই কৌশল গ্রহণ করতে হয়েছে। তাই সেই পুরুষ-রতনের নানান ক্রিয়াকাণ্ড, গুণ ও রূপের সমাহার ঘটিয়ে 'কে তিনি?' তা বোঝাতে হয়েছে। নিজের পতি নির্বাচন — এই পূর্বরাগ

মিশ্রিত লজ্জা রুক্মিণীকে সংযত করেছে। আর সেই স্ব-নির্বাচিত পতিকে চিনিয়ে দিতে এই পত্রের পথটি গ্রহণ করতে হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত আধুনিক বাংলার নবজাগ্রত বাংলার প্রথম কবি। তাঁর আধুনিকতা ছন্দে, বিষয় ভাবনায়, অলঙ্কার প্রয়োগে, এমনকি শব্দ নির্বাচনেও। একদিকে যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দের ক্রম-পরিণতির ধারায় একে একে কাব্য রচনা করতে করতে 'বীরাঙ্গনা'য় পৌঁছে শেষ জীবনে সনেটে পৌঁছেছিলেন, তেমনি নতুন বিষয় নিয়েও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। রোমক কবি ওভিদের 'Heroic Epistles'-এর পত্রকাব্য রীতির দ্বারা মধুসূদন অনুপ্রাণিত হলেও ওভিদ যেভাবে ইহুদী ভাবনার দ্বারা পুরাণের নায়িকা চরিত্রগুলির মধ্যে প্রথা-সংস্কারের সঙ্গে কামনার সংঘাতকে মুখ্য করে তুলেছিলেন কবি মধুসূদন সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পুরাণের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে আধুনিক মননের ছায়াপাত ঘটিয়ে যুগবৈশিষ্ট্যকে চেনাতে চেয়েছিলেন। ল্যাটিন সাহিত্যে পত্র-সাহিত্যরীতি বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে দু'চারটি ক্ষেত্রে পত্র লেখার আভাস-ইঙ্গিত থাকলেও তা পত্রকাব্যের রূপ গ্রহণ করতে পারে নি। 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রটির পূর্বাভাস শ্রীমদ্ভাগবতে পেলেও আধুনিক কবি— অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবি মধুসূদন নব কৌশলে ও নব ভাবনায় এটিকে নবরূপ দান করেছেন। তাছাড়া ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মুক্তিপ্রদ-নৃসিংহ-সর্বব্যাপক-সর্বসাক্ষিন্ রূপের কাছে ভক্তেই সমর্পিত-প্রাণ রুক্মিণী আশ্রয় চাইছেন — এটিই পত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়। আর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের রুক্মিণী ঊনিশ শতকের নবজাগ্রত রোমান্টিকতা মিশ্রিত পূর্বরাগে অভিষিক্ত হয়ে একদিকে নিজে নিজে পতি নির্বাচনের লজ্জা-রাঙা অভিব্যক্তি, অন্যদিকে স্ব-নির্বাচনকে বাস্তবায়িত করার অদম্য তাগিদে লাগামহীনভাবে গুরু ও কুলরাজির ডালা সরিয়ে বাঞ্ছিত পুরুষটিকে চিহ্নিত করতে সদা সচেষ্ট। তাই মধুসূদন পুরাণ চরিত্রটিকে আধুনিক মননে সমৃদ্ধ করতে অভিনব কৌশলে রুক্মিণীর মনের দরজা একটু একটু করে উন্মোচিত করেছেন। ভাষা ও ছন্দ হয়ে উঠেছে এখানে প্রধান হাতিয়ার।

প্রথমত এই পত্রে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর দ্বারা যে বিশেষণগুলিতে বিশেষিত হয়েছেন তা লক্ষণীয় — হৃষীকেশ, যাদবেন্দ্র, অরুক্ত, রাখালরাজ, দীনবন্ধু, পুরুষোত্তম, দেবনরোত্তম, দয়াসিন্ধু, যদুমণি, যদুপতি, গদাধর, গুণনিধি, দ্বারকাপতি, ব্রজপতি, পীতাম্বর, রসরাজ,

শ্রীপতি, মুরারি, মধুসূদন ইত্যাদি। এগুলি শ্রীকৃষ্ণের নানা গুণের পরিচয়; অসহায় রুক্মিণী নিজ মনোবার্তা পৌঁছে দিতে নানা অনুল্লিখিত কথার ব্যগ্রতায় এত গুণরাজিকে সমাহৃত করেছেন। মধুসূদনের বাংলা ভাষা-চর্চা কত সমৃদ্ধ ছিল, বিষয়ের উপযোগী বিশেষণ প্রয়োগে তা প্রমাণিত। তাছাড়া এক-একটি পরিস্থিতি-পরিবেশকে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও তারল্যে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় তা নব নব শব্দ অন্বেষণকারী মধুসূদনের জানা ছিল। এই পত্রে শ্রীকৃষ্ণের কারাগারে জন্মস্থানে পৃথ্বীমণ্ডলে কোন্ প্রবাহ ধ্বনিত হয়েছিল তার ভাষাচিত্রটি দেখা যাক্ -

'দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে!
খনিগর্ভে ফলে মণি; মুক্তা শুক্তিধামে!
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে;
শত-শরদের শশী-সদৃশী শোভিল
বিভা! গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ; নদ নদী কলকলকলে
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি;
কল্লোলিলা জলপতি গম্ভীর নিনাদে!'

এই ভাষার লালিত্য ও প্রবহমানতা গোটা অংশটিকে সংগীতধর্মী করে তুলেছে। 'বীরাঙ্গনা'র প্রতিটি পত্র সম্পর্কে একই কথা বলা না গেলেও 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রটি যে কবির কৌশলগত দক্ষতা প্রকাশের বিশিষ্ট ক্ষেত্র এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা থাকে না।